

এ এক অদ্ভুত গল্প

- জয়দীপ দত্ত

- “এই ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়?”
- “ছুটিতে? ইন্টার কিলিক করো...”

সত্যি, অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয় না। চান-খাওয়া-অফিস-ঘুম-চান-খাওয়া... থোড়-বড়ি-খাড়া-খাড়া-বড়ি-থোড়। আজকাল বড্ড একঘেয়ে লাগে। কোথাও ঘুরে আসলে মন্দ হত না।

অবিশ্যি যেতে তো কোন বাধা নেই। মানুষ বলতে তো আমি একা। আত্মীয় বলতেও তেমন কেউ নেই। সুরেশটা ছিল, সেও নিখোঁজ হয়ে গেছে আজ দু'বছর হল। এখন আমি একা... বিলকুল একা। যেকোন দিন মোহনবাবুকে বলে বেরিয়ে পরলেই হয়।

সুরেশটা চলে যাওয়ার পর জীবনটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল ও। ও আর আমি একসাথেই চাকরি পেয়ে কলকাতায় আসি। উঠি মোহনবাবুর বাড়ী পেইংগেস্ট হয়ে। সেই থেকে একসাথেই ছিলাম। কিন্তু বছর দুই আগে... কী যে হল! সুরেশটা হঠাৎই... কাউকে কিছু না বলে... কোথায় যে গেল!

ছুটিতে ঠিক করলাম চন্দনগুড়িই যাব। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শহর, নিরিবিলিতে ভ্রমণের পক্ষে দুদান্ত। অবিশ্যি এটাই একমাত্র কারণ নয়... বছর দুয়েক আগে এখানে এসেই সুরেশ নিখোঁজ হয়।

দুবছর আগে এরকমই একটা পুজোর ছুটিতে সুরেশ গিয়েছিল চন্দনগুড়ি বেড়াতে। ওর কী এক দূরসম্পর্কের মামা ঐখানে থাকে, সেখানেই উঠেছিল। আমিও সঙ্গে যেতাম, কিন্তু আমার আবার তখন পিসতুতো বোনের বিয়ে পড়ে গেছিল। তাই সুরেশ একাই গেল। এখন মনে হয় সুরেশের সঙ্গে গেলেই ভাল হত। আমি থাকলে হয়ত ছেলেটা এইভাবে নিখোঁজ হত না!

অবিশ্যি পুলিশ অনেক খুঁজেছিল। কাগজে, টিভিতে ঘোষণাও বেরিয়েছিল। কিন্তু এইসব কেসে যেমন হয় আরকি! আমি বা সুরেশ কারোরই তেমন ধরাকরা ছিলনা যে একটু তদ্বির-তদারক করবে। কেসটা নিয়ে প্রথম কটা দিন একটু হইচই হল... তারপর আর পাঁচটা ফাইলের তলায় চাপা পড়ে গেল।

* * *

আজ পাঁচ তারিখ। পাঁচই অক্টোবর দুহাজারপাঁচ। কাল আমি বেরোছি। সকাল সাড়ে ছ'টায় শেয়ালদা থেকে ট্রেন। তাই সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বেরোতে হবে। শেয়ালদা থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে শেরগাঁও। সেখান থেকে বাসে চন্দনগুড়ি।

শেরগাঁও যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে ন'টা। এত রাতে আর বাস পাওয়া যাবে না। তাই রাতটা কোনওভাবে কাটিয়ে ভোরভোর বাস ধরতে হবে। শেরগাঁও রেলওয়ে জংশন। তাই হোটেল পেতে অসুবিধে হল না। পরদিন অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাস ধরলাম।

চন্দনগুড়িতে পৌঁছলাম প্রায় বেলা ১টা ১৫তে। এমনিতে এত দেরি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু মাঝপথে একটা জায়গায় কী কারণে বাসটা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দাঁড়িয়ে ছিল। অবিশ্যি এতে লোকসান বিশেষ হয়নি কারণ যেখানে বাসটা দাঁড়িয়েছিল তার সিনিক বিউটি দেড়ঘন্টায় ফুরোবার নয়।

আজকে পৌঁছেই একবার পুরো ব্যাপারটা ছকে ফেললাম। প্রথমেই সুরেশের সেই মামার খোঁজ করতে হবে। তিনি নাকি আবার ওই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী বড়োলোক। বিরাটবড় টি-এস্টেট আছে তাঁর। নাম শশাঙ্ক শেখর দেব।

বিকেলে একটু চারদিকটা ঘুরে দেখে নিয়ে রান্তিরটা রেষ্ট নিলাম। কালকে যাব সুরেশের ওই মামার সঙ্গে দেখা করতে।

* * *

পরদিন সকাল ন'টায় বেরোন গেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই পুরানাবাজার। পুরানাবাজারে অনেক দোকান আছে যেখানে জিপগাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। সেরকমই একটা জিপ ভাড়া করলাম সুরেশের মামার সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাড়ী চিনতে অবিশ্যি অসুবিধার কারণ নেই কারণ তাঁকে এখানে একডাকে সবাই চেনে।

বাড়ীতো নয়! দু'গ একটা। নামটাও সেই রকম, 'মহারাজ কাসল'। চারদিকে প্রায় আটফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল এরিয়া জুড়ে বাড়ী। বিশাল বড় গেট, যাকে বলে 'সিংহদুয়ার'। গেটের পাশে দারোয়ান। গিয়ে বললাম, ঢুকতে দিল না। শেষটায় চিরকুট পাঠাতে হল। ডাক এল মিনিট পাঁচেক পর।

পাঁচিলের ভেতর ঢুকতেই বিশাল বড় লন। তাতে সবুজ ঘাসের গালিচা আর নানা রকম ফুলের গাছ। দেখলেই বোঝা যায়, প্রচুর পরিশ্রম আর প্রচুর টাকা দুইই ব্যয় হয় এই বাগানের দেখাশুনার কাজে। লনের মধ্যে দিয়ে একটা চওড়া সিমেন্টে বাঁধানো রাস্তা আছে। প্রায় একশো মিটার লম্বা। তারপর একটা বিরাট প্রাসাদোপম তিনতলা বাড়ী। বাড়ীর পাশ দিয়ে আরেকটা সরু রাস্তা চলে গেছে বোধহয় বাড়ীর পিছনদিকে যাওয়ার জন্য।

সুরেশের মামা বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন,

- “এসো এসো, তা সুরেশ তো তোমার বন্ধু ছিল?”

- “আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই হাইস্কুল থেকেই। তারপর চাকরিও পাই একই কোম্পানিতে... সুরেশ আমার খুব বন্ধু ছিল।”

- “বুঝি বুঝি, তোমার কষ্টটা আমি বুঝি। তারপর, এখানে কি ঘুরতে এসেছো? ... আঃহা, তুমি দাঁড়িয়ে কেন! বসো বসো।”

- “না না ঠিক আছে।” আমি বসলাম।

- “তারপর? ঘুরতে এসেছো?”

- “আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকদিন ধরেই কোথাও যাওয়া হয়না। সুরেশটা মিসিং হওয়ার পরথেকে লাইফটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। তাছাড়া সুরেশের মুখেও জায়গাটার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি।”

- “তা অবিশ্যি তুমি ঠিকই করেছ বুঝলে। এমন জায়গা, এমন সুন্দর অথচ শান্ত, নিরিবিলি তুমি আর কোথাও পাবেনা।

- তা তুমি উঠেছো কোথায়?”

- “হোটেল স্নো ভিউ।”

- “সে কি? এই শহরে আমি থাকতে তুমি হোটেলে থাকবে কেন? হাজার হোক সুরেশের বন্ধু তুমি! না না না, কাল সকালেই চেক আউট করে আমার এখানে চলে আসবে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। না না না, কোনো আপত্তি আমি শুনবনা। ও হো হো... দেখেছো! একদম ভুলেই গেছি! তোমার নামটাই তো জানা হয় নি।”

- “আমার নাম রুদ্র। রুদ্রনীল রায়।”

- “বেশ বেশ, আমায় তুমি মামাবাবু বলেই ডেকো।” সামান্য কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, “আচ্ছা, তুমি তাহলে

এখন এসো। আমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। কাল আবার কথা হবে।”

- “না মানে, ইয়ে, আমি বলছিলাম, কী দরকার ঝামেলায় গিয়ে। হোটেলেরি তো ঠিক আছে।”

- “না না। না বললেই আমি শুনব কেন? কালকে আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। চলে এসো, কেমন!”

- “আচ্ছা।”

মামাবাবু লোকটাকে বেশ ভালো বলেই মনে হল। হট করে তিনি যে আমাকে থাকতে বলে বসবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি। তবে এ বেশ ভালই হয়েছে। হোটেলের বিলও গুণতে হবে না, আর তাছাড়া মামাবাবুর বাড়ীর লোকেশানটা এত সুন্দর যে শুধু বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে এক কেলেঙ্কারী। জল যে এতটা ঠান্ডা হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। হট করে মুখে ঢালতেই দাঁত পুরো কনকন করে উঠেছে। কোনোরকমে মুখটুখ ধুয়ে হোটেলের ঘরে বসে চা আর একটা স্ন্যাক্স খাচ্ছি, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল যে মামাবাবুর গাড়ী এসে গেছে।

* * *

গাড়ী আমায় নিয়ে চলল মামাবাবুর বাড়ীতে।

“আরে এসো এসো! সকালের লুচিতে ঠান্ডা হয়ে গেল।”

লুচি আর আলুরদম খেতে খেতেও আবার উঠল সুরেশের প্রসঙ্গ। সত্যি, খেতে বড্ড ভালবাসত সুরেশ। মামাবাবুই বললেন, “এইদেখ তুমি এলে, সুরেশ থাকলে কত ভাল হত বলতো”

আমি বিষন্ন মুখে একটু শুধু হাসলাম।

মামাবাবু বলে চললেন, “তা সুরেশ আর তুমি তো একইসাথে থাকতে?”

- “হ্যাঁ।”

- “যাক, ছাড়ো ওসব কথা, যে মারাই গেছে তাকে নিয়ে আর ভেবে কি লাভ?”

বেশ অমায়িক লোক এই মামাবাবু। হলেই বা আমি তার ভাগের বন্ধু, এইভাবে বাড়ীতে ডেকে এত আপ্যায়ন কজনইবা করে। কিন্তু, মামাবাবুর এই কথাটাতে আমার মনটা কেমন যেন খচ্ করে উঠল। আজ দুবছর হল সুরেশ নিখোঁজ। ওর মা-বাবাও হয়তো আশা ছেড়েই দিয়েছেন। কিন্তু সুরেশ মারা গেছে এই কথাটা মামাবাবু এত জোর দিয়ে বলছেন কীকরে?

- “কী হল? কী ভাবছ এত? নাও হাত ধুয়ে নাও। অ্যাই হরে, প্লেট দুটো নিয়ে যা।

এসো, তোমাকে এই বাড়ীটা ঘুরিয়ে দেখাই।”

আমি সন্নিহিত ফিরে পেলাম। বললাম, “চলুন।”

সত্যি, বিশাল বড় বাড়ী মামাবাবুর। সামনের দিকে আছে বিশাল ফুলের বাগান যার অর্ধেক ফুলের আমি নামই জানি না। এইদিকটা অবশ্য কালকেই দেখেছি।

বাড়ীর পিছন দিকে আছে বেশকিছুটা খোলা জায়গা যার বেশকিছুটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো তাতে বর্গাকার খোপ খোপ কাটা। দেখে মনে হয় ইঁট দিয়ে নয় বরং ঢালাই করা স্ল্যাব পেতে পেতে চত্বরটা বানানো। তবে যেটা অদ্ভুত লাগল সেটা হল, বাঁধানো জায়গাটা ঠিক চৌকো নয়। কেমন যেন এলোমেলো আকারের। আর সবটা একই সাথে বানানো হয়নি। চত্বরটার পেছনের দিকের অংশ সামনের দিকের তুলনায় বেশ নতুন কারণ তাতে শ্যাওলার ছোপ নেই।

* * *

দুপুরের খাওয়ায়ও এলাহি ব্যাপার। ভাত, লালশাকভাজা (চিনেবাদাম দিয়ে), মুড়িঘন্ট, পাঁঠার মাংস আর পায়ের। আমি বললাম, “একি মামাবাবু, একী করেছেন! আমি এত খেতে পারব?”

- “আরে, খেয়ে নাও! খেয়ে নাও! শোনো, তোমায় একটা কথা বলি, খাবার পেলে কোনদিন ছাড়বে না। কখন কি হয় কিছু কি বলা যায়? হাঃ হাঃ হাঃ!”

মামাবাবুর গলাটা কিছুটা অদ্ভুত শোনালো।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে জন্মের ঘুমিয়ে পড়লাম। আজকে তো তেমন কোথাও ঘোরা হলনা, রাত্রে দিকে বাজারের ওদিকটা ঘুরে আসা যাবে। বাদবাকী কাল সকাল থেকে।

ঘুম ভাঙলো চাকর হরে-র ডাকে। দেখলাম, পাঁচটা বেজে গেছে।

- “বাবু, চা।”

- “ও আচ্ছা, রেখে যাও।”

- “বাবু, বাবু বসার ঘরে বসি আছেন। আমাকে বললেন আপনার ডাকবার জন্য।”

- “আচ্ছা, তুমি যাও, আমি মুখটুখ ধুয়ে আর এই চাটা খেয়ে আসছি।”

- “আজ্ঞে।”

* * *

তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আমি বসার ঘরে এলাম।

- “এসো, এসো, তোমার জন্যই বসে আছি।”

- “না আসলে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।” আমি একটু লজ্জিত হয়েই বললাম।

- “আরে না না! তাতে কি হয়েছে! আরে, বেড়াতে এসে ঘুমোবে না তো কি অফিসে গিয়ে ঘুমোবে? হাঃ হাঃ হাঃ। যাক সে কথা। এসো তোমাকে এবার বাড়ীর ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাই।”

সত্যিই বেশ বড় বাড়ী এই মামাবাবুর। ঠিক প্রাসাদের মত। বড় বড় ঘর। বাড়ীর ঠিক মাঝখানে বিশাল বড় একটা হলঘর। হলঘরের দেওয়ালে বড় বড় ফ্রেমে ছবি টাঙানো। বেশীরভাগই অয়েল পেন্টিং। চারটে ছবি ক্যামেরায় তোলা। বোধহয় মামাবাবুর পূর্বপুরুষদের।

হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মামাবাবু বললেন, “দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।”

বলে তিনি সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে একটা সুইচ টিপলেন। অমনি মেঝের একটা অংশ সরে গিয়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। একটা সিঁড়ি সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে নেমে গেছে।

- “এসো আমার সঙ্গে।”

আমি মামাবাবুর পেছন পেছন আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সিঁড়িটা একটানা অনেকটা নেমে গেছে এমন নয়। চার-পাঁচ ধাপ পরপরই একটা করে চাতাল আর তার পর সিঁড়িটা একটু বেকে গেছে। হাল্কা আলো জ্বলছে। এইভাবে কিছুটা নামার পর আর একটা হলঘরে পড়লাম।

ঘরটার মধ্যে দুটো টিউবলাইট জ্বলছে। আর কি একটা যেন চাপা যান্ত্রিক আওয়াজ। একপাশে সারি সারি আলমারির মত সাজানো। ঠিকমত দেখতে বোঝা গেল ওগুলো আসলে একেকটা ফ্রিজার। শব্দটা ওইগুলো থেকেই আসছে। ঘরের

অন্যদিকে দুটো কাঠের আলমারী। আর ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা কাঠের টেবিল। তাতে সাদা রঙের টেবিলক্লথ পাতা। ছাদ থেকে একটা আলো এসে ঠিক ওই টেবিলটার একটু ওপরে ঝুলছে। টেবিলের পাশে কী একটা বড়মত জিনিস। কভার পরানো থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মামাবাবু মুখ খুললেন।

“এইবার তোমাকে আমার শখের কথা বলব। তার আগে এসো তোমায় একটা জিনিস দেখাই।” বলে তিনি এগিয়ে গিয়ে ফ্রিজার গুলোর দরজা একটা একটা করে খুলতে লাগলেন। ভয়ে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আর নড়াচড়ার শক্তি আমার নেই। ফ্রিজার গুলোর মধ্যে থরে থরে সাজানো নানান অস্বাদ্য পদার্থ। পঞ্চাশটা মানুষের কাটা মুণ্ড।

মামাবাবু বলে চললেন, “আসলে এই আমার বিচিত্র শখ। জ্যাক্ত মানুষের মুণ্ড জমানো। এই যেমন দেখ, একে তুমি চিনতে পারবে। এ হল সুরেশ ব্যার্নাজী। তোমার বন্ধু। আমার লেটেস্ট কালেকশন।” বলে সুরেশের মুণ্ডটাকে বারকরে এনে আমাকে দেখিয়ে আবার স্বস্থানে রেখে দিলেন। ভয়ে তখন আমার মুখ দিয়ে গোঙানি বের হচ্ছে। আমার সাড়া দেহ ভয়ে অসাড়। কোনোমতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। অজ্ঞান যে হইনি কেন সেইটাই আশ্চর্য।

মামাবাবু বলে চলেছেন,

- “আমি কিন্তু কাউকে মারতে চাইনা জানো, শুধু মুণ্ডটুকু কেটে রেখে দিই। কিন্তু কি করব বলো, মুণ্ডটুকু কাটতেই বাকী দেহটাও সাথে সাথে ধড়ফড়িয়ে মরে যায়। তাই তো ওপরে শানের নিচে স্কন্ধকাটা লাশগুলোকে পুঁততে হয়। লম্বা লম্বা গর্ত করে লাশগুলো পুঁতে ওপরে বেশ কিছুটা নুন দিয়ে স্ল্যাব চাপা দিয়ে দিই। নুন দেওয়াতে সহজে পচে না। কী ঝামেলা বলোতো! এসো এসো, তুমি আর মেলা দেবী কোরো না। এই টেবিলে শুয়ে পড়ো। সামান্য সময়ের ব্যাপার। তুমি বুঝতেও পারবে না।” বলে তিনি টেবিলটার পেছনের জিনিসটার ঢাকা সরিয়ে নিলেন। সেটা একটা ইলেক্ট্রিক করাত।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইলেক্ট্রিক করাতের সুইচ অন করে এবার মামাবাবু আরো ঠান্ডা গলায় বললেন, “কী হল? ফালতু দেবী করছ কেন? এখন কত কাজ বাকী দেখনি? রক্ত পরিস্কার করতে হবে। তোমার বডিটাকে ওপরে নিয়ে যেতে হবে। হরোট্টা অবশ্য তোমার থেকে বেশী চটপটে। এতক্ষণে তোমার জন্য গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। তবু, বাদবাকী কাজগুলো সারতে সময় লাগবে তো। তাড়াতাড়ি করো! রাতের খাবার নষ্টার পর খেলে আমার আবার অম্বল মত হয়।”

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। মামাবাবু এবার একটু নরম সুরে বললেন, “ভয় করছে? আরে ভয়ের কী? শুধু গলাটা কাটব। মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। একটুও লাগবে না। আর তাছাড়া বেঁচে থেকেই বা কী হবে! মরতে তো আমাদের সবাইকেই হবে একদিন না একদিন।” একটু থেমে মামাবাবু শান্তভাবে বললেন, “আর হ্যাঁ, পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ ওপরে ওঠার দরজা বন্ধ। আমি ছাড়া ওটা কেউ খুলতে পারবে না।” বলে তিনি আমার হাত ধরে আলতো করে টান দিলেন।

পালাবার শক্তি আর আমার নেই। আমি মস্তমুণ্ডের মতো টেবিলটাতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওপর থেকে ইলেক্ট্রিক করাত নেমে এল। প্রথমে গলার কাছটা ঠান্ডামতো লাগল। তারপর মুহূর্তের জন্য ভীষণ জ্বালা। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

আমার মুণ্ডটুকু এখন মামাবাবুর ভূর্গভ কুঠুরির তিন নম্বর ফ্রিজারের দুই নম্বর তাকের একপাশে সাজানো রয়েছে পরবর্তী সঙ্গীর অপেক্ষায়।

Plot conceived: 26/05/2003.
First part written: 24/05/2004.
Last part written: 03/01/2007.

Author: Joydip Datta (<http://www.geocities.com/joydipdattaonline>)